ধারাবাহিক "আলোর বাতিঘর" সিরিজ- ৪

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

ধারাবাহিক "আলোর বাতিঘর" সিরিজ - ৪

জাজি'র রণক্ষেত্র

(প্রথম পর্ব)

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ লীবী রহ. বলেন,

জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করবেন। সংশোধন করবেন পুরা উম্মাহকে।

শাইখ আবু মুসআব আয-এরকাবী রহ. বলেন,

আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বলছি, আমার সর্বস্ব দিয়ে আপনার সামনে সমাজের চিত্র স্পষ্ট করে তুলব।

শাইখ আবু হামজা জর্দানী রহ. বলেন,

আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদদের কাছে যে স্বার্থ ও মনোবল থাকে, তা কাফেরদের কাছে থাকে না। আমাদের নিহতরা যায় জান্নাতে আর তাদের নিহতরা জাহান্নামে।

মোল্লা দাদুল্লাহ রহ. বলেন,

সত্যের জন্য অকাতরে জীবন দেব, তবু বাতিলের কাছে নত হব না।

শাইখ আবুল লাইস আল-লীবী রহ. বলেন,

উম্মাহর অনেক ভারী বোঝা বহন করতে হয় আমাদের।

শাইখ আবু রুসমা ফিলিস্তিনী রহ. বলেন,

শাইখ আবু কাতাদা তেমন বড় কিছু করেননি। তিনি শুধু হক কথা বলতেন।

শাইখ দোস্ত মুহাম্মাদ রহ. বলেন,

আমরা আলেমদের উদ্দেশে বলব, আপনারা ইলম অনুযায়ী আমল করুন। কারণ আলেমরা নবীদের ওয়ারিস।

শাইখ আব্দুল্লাহ সাইদ রহ. বলেন,

জিহাদের মাধ্যমেই উম্মাহ জীবন লাভ করবে। আল্লাহ বলছেন,

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে ঐ কাজে ডাকে, যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে’।

শাইখ আবু উসমান আশ শিহরী রহ.

শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে এ মহান নেয়ামতের মূল্যায়ন করুন। হে আল্লাহর বান্দা, নিজেকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ে অভ্যস্ত করে তুলুন।

শাইখ আবু তালহা জার্মানী রহ.

আমরা জিহাদ করি আর বিজয়ের গান গেয়ে উম্মাহর মাঝে প্রাণ সঞ্চার করি।

শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লীবী রহ. বলেন,

প্রিয় পিতা, বিচ্ছেদের পরেই তো সাক্ষাৎ পর্ব আসে।

শাইখ মুস্তফা আবু ইয়াযিদ রহ. বলেন,

আপনাদের সাথে মিলিত হতে চাই, যাতে আপনাদের ইমান থেকে নূর গ্রহণ করতে পারি।

****

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلاهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

আমাদের আজকের আলোচনা ইসলামের বর্তমান যুদ্ধসমূহ থেকে একটি মহান যুদ্ধ নিয়ে। আমরা আলোচনা করব সত্য-মিথ্যার মাঝে চূড়ান্ত পার্থক্যকারী একটি যুদ্ধ নিয়ে, যা আফগানিস্তানের বরকতময় পবিত্র ভূমিতে অনেক বছর ধরে চলমান একটি দীর্ঘ যুদ্ধকে সমাপ্তিতে পৌঁছে দিয়েছিল।

আমাদের আলোচনা বিখ্যাত "জাজি'র যুদ্ধ" নিয়ে। যেখানে আল্লাহ তাআলা হক ও হকের ঝান্ডাবাহীদের সাহায্য করেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্য। আমরা আলোচনা করব জাজি'র যুদ্ধের ব্যাপারে, যা ইসলামের বড় বড় ঐতিহাসিক যুদ্ধসমূহের একটি।

আল্লাহ তাআলা নবী আলাইহিস সালাম ও মুমিনদেরকে ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে ফযিলতপূর্ণ যুদ্ধ বদরে সাহায্য করে তাঁদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। বদর যুদ্ধ কতটা মহান তা কল্পনাও করতে পারবেন না। উমর রা. যখন হাতেব বিন আবী বালতাআ রা.-কে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, তখন এই যুদ্ধের ফযিলত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

(وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم).

'তুমি কি জানো না, আল্লাহ তাআলা বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে জেনে নিয়েছেন? এ কারণে তো তিনি বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

তাওহীদের পতাকার পক্ষে অবস্থানকারীর সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে যে সমস্ত চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধে বিজয় দিয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, খালেদ বিন ওয়ালীদ রা.-এর নেতৃত্বে ইয়ারমুকের যুদ্ধ, পারস্যের বিরুদ্ধে কাদিসিয়ার যুদ্ধ, নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ, আইনে জালুতের যুদ্ধ, এবং বাইতুল মাকদিসের অবৈধ দখলদার খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর নেতৃত্বে হিত্তিনের যুদ্ধ। এমন অনেক বড় যুদ্ধে আল্লাহ মুমিনদের বিজয় দান করেছেন।

বর্তমান সময়ের 'জাজি যুদ্ধ' হচ্ছে বিশাল একটি সামগ্রিক লড়ায়ের সমাপ্তি। এই যুদ্ধের আগে হাজারো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বর্তমান যুগের এক সুপার পাওয়ারের সাথে, এর নাম ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। পূর্ব দিকে ছিল রাশিয়া ও তার মিত্র শক্তি মিলে 'ওয়ারসো জোট'। পশ্চিমে ছিল আমেরিকা ও তার মিত্র শক্তি মিলে 'ন্যাটো জোট'। এই লড়াই গত শতাব্দীর শেষ দিকে ১৩৯৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হওয়া বিশাল একটি যুদ্ধকে চূড়ান্ত সমাপ্তিতে পৌঁছে দিয়েছিল।

আল্লাহর ইচ্ছায় এই যুদ্ধটা ছিল স্পষ্ট বিজয় এবং বিরাট এক অলৌকিক ঘটনা। কারণ এর মাধ্যমে সেদিন এ যুগের বস্তুবাদী তাগুতি শক্তির সকল দম্ভ অহংকার খতম হয়েছিল। এটা সে সময়ে, যে সময়ে আধুনিক অস্ত্রে অকল্পনীয় উন্নতি সাধন করা হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের হাতে উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধাস্ত্র ছিল না, তাদের শাসকরা দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত ছিল এবং আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাস্তবায়ন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিল। এর আবশ্যকীয় ফল ছিল তারা আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করেছিল; বরং যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রত্যেককে তারা জেলখানায় আবদ্ধ করে রেখেছিল।

সেই সময়ে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে মওজুদ ছিল বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক হাজারো যুদ্ধযান ও উন্নত ট্যাংক বহর। আজ থেকে প্রায় ২০ বছরের কিছু পূর্বে তাদের কাছে শব্দের গতির চেয়ে তিনগুণ দ্রুত গতিসম্পন্ন অত্যাধুনিক হাজারো বিমান ছিল। আরও ছিল অস্ত্রে সজ্জিত লক্ষ লক্ষ সেনা। এই বিশাল রাষ্ট্রটি আফগান প্রশাসনের সাথে মিলে সেই দেশে সমাজতন্ত্র প্রচারের চেষ্টা করে। অতঃপর সেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাদের অনুগত নেতা বারবাক কারমালের মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দখল করে নেয়। সর্বশেষ ১৯৭৯ সালের শেষ দিকে এই হিংস্র লাল বাহিনী কাবুলে প্রবেশ করে, যেটা ছিল ১৩৯৯ হিজরী।

এই বিশাল ঘটনাটি তখন পুরো পৃথিবীকে প্রকম্পিত করেছিল। এই ভয়াবহ খবরটি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিল। আরবসহ পুরো বিশ্বে তাদের শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ভয়ংকর ঘটনাটি মূলত পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ ও ন্যাটো জোটের ক্ষমতার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল। রাশিয়া যখন ইউরোপের পূর্বের অংশ দখল করেছিল, তখন এই ন্যাটো জোট (এই জোটে আমেরিকা, ইউরোপসহ অন্যান্য অধিকাংশ দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল) ইউরোপে যুদ্ধ প্রস্তুতি ও প্রতিরক্ষা অস্ত্রের পেছনে প্রায় সাড়ে চারশ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল। এসবই করেছিল ইউরোপের উপর রাশিয়ার আক্রমণের ভয়ে। তারা(ন্যাটো জোট) কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত শক্তিগুলোকে একত্রিত করেছিল, যেমনটা পূর্বে রোমানিয়াতে করেছিল।

ষাটের দশকে কোন রাষ্ট্র যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের আনুগত্য করতে অস্বীকার করত, তাদের শাসক ও কমান্ডাররা নিজেদেরকে রাশিয়ান ট্যাংকের নিচে আবিষ্কার করত। রাশিয়ানরা বিশাল বিমান বহর, সেনাবাহিনী ও অস্ত্র বহন করে নিয়ে আসত এবং পুরা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিত। একারণে সমস্ত মানুষ এই কমিউনিস্টদের অনুগত দাসে পরিণত হয়েছিল।

এই লাল দানব হিংস্র রাশিয়ান ভাল্লুক হঠাৎ করেই ১৩৯৯ হিজরীতে তার বিমান ও ট্যাংক বহর নিয়ে কাবুল দখল করে বসে। তারা এসেছিল তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কেমেনিস্তান দিয়ে। এর ফলে রাজধানীসহ সমস্ত জনগণ ক্রুসেডার রাশিয়ার দখলদারিত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এই পর্যায়ে এসে রাশিয়ার আফগানিস্তানে প্রবেশের পূর্বের অবস্থা একটু বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক। কেন রাশিয়া আফগানিস্তানের প্রবেশ করেছিল? আফগানিস্তান কি তাদের মৌলিক কোন স্বার্থ ছিল? নাকি মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি অন্য কোন স্বার্থ ছিল?

তখনকার সময়ে রক্তপিপাসু কিছু পক্ষ একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করছিল। তারা ছিল পূর্ব ও পশ্চিম, অর্থাৎ রাশিয়া ও আমেরিকা। মুসলিম বা অমুসলিম - সকল রাষ্ট্রের উপরই আক্রমণ করে রক্ত প্রবাহিত করার প্রতিযোগিতায় তারা নেমেছিল। এসময় রাশিয়া তাদের সাথে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে আরবসহ অনেক ইসলামী রাষ্ট্র ছিল। যদি আপনি মানচিত্রের দিকে তাকান, তাহলে দুই ব্লকের মাঝে প্রতিযোগিতার স্বরূপটা বুঝতে পারবেন।

এই হচ্ছে ইউনিয়ন, এর মধ্যে রঙিন অংশগুলো রয়েছে, এটা সবটাই সোভিয়েত ইউনিয়ন। এটা ছিল বিশাল বিস্তৃত এক শক্তি, এই অঞ্চলগুলো তার অনুগত ছিল। আজারবাইজান, শীশান ও তার আশপাশ, তুর্কেমিনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্থান - এই সবগুলো রাষ্ট্রই সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিশাল দানব রাষ্ট্রটি দুর্বল একটি রাষ্ট্রে প্রবেশের ফলে মানুষ অবাক হয়ে গিয়েছিল। যারা সংখ্যায়, শক্তিতে ও যুদ্ধাস্ত্রে অনেক ছোট ছিল। ১৩৯৯ হিজরীতে আফগান প্রশাসনের সহয়তায় তারা এখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এই ছোট রাষ্ট্রটির এবং রাশিয়ান লাল ভাল্লুক বিশাল দানবের মাঝে সকল বিষয়েই বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান ছিল।

মানুষ কখনো কল্পনাও করেনি, এই দুর্বল রাষ্ট্রটি রাশিয়াকে পরাজিত করবে অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করার ফলে শুধু পরাজিতই করেনি; বরং তাদের নিশানা পর্যন্ত জমিনের বুক থেকে মুছে দিয়েছে। সকল প্রশংসা ও দয়া একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই।

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার)

সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাককে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। তারা ইরাকে প্রবেশ করে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় চেতনা ও সংবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ইরাকি বার্থ পার্টি মুসলিম সন্তানদেরকে কমিউনিজমের দিকে আহ্বান করতে থাকে এবং তাদেরকে সমাজতন্ত্র ও নাস্তিকতা শিক্ষা দিতে থাকে। এর ফলে তারা বার্থকে আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

এই হচ্ছে সিরিয়া, এটাও সোভিয়েত জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে তারাও সমাজতন্ত্রকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের স্লোগান ছিল, 'ঐক্য মুক্তি সমাজতন্ত্র'। যা স্পষ্ট কুফুর, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এমনিভাবে কমিউনিষ্ট লাল সেনারা দক্ষিণ ইয়েমেনে প্রবেশ করে, এর ফলে ইয়েমেন সমাজতন্ত্র দিয়ে পরিচালিত হতে থাকে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অতঃপর সোভিয়েত জোট আরো অগ্রসর হয়ে সোমালিয়া দখল করে নেয়। এর ফলে প্রেসিডেন্ট সিয়াদ বারি-এর সময়ে সোমালিয়া কমিউনিষ্টপন্থী হয়ে যায়। যখন সে সমাজতন্ত্রের ধ্বংসাত্বক নীতি রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, তখন তার সামনে কিছু আলেম বাঁধা হয়ে দাঁড়ালেন। যারা কিছু টাকা ও কয়েক লোকমা খাবারের জন্য দ্বীনের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা সমাজতন্ত্রেকে প্রত্যাখ্যান করলেন, যা সিয়াদ বারি মানুষের উপর বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছিল। ফলে সিয়াদ বারি সেই সমস্ত আলেমকে মোগাদিশু'র একটি মাঠে একত্রিত করে এবং তাঁদেরকে জনসম্মুখে আগুনে পুড়ে হত্যা করে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং দ্বীনের সাহায্যে জীবন দেওয়ার কারণে উম্মাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে উত্তম বদলা দান করুন।

পরবর্তীতে তারা মুসলিম ইরিত্রিয়াতে প্রবেশ করে এবং জনতা পার্টির নামে কমিউনিজমের ধারণা ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। এভাবেই কমিউনিষ্ট বাহিনী সোভিয়েত নাস্তিকতাকে বহন করে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। কোনো কিছুই তার সামনে বাঁধা হতে পারছিল না, কোনো শক্তিই তাকে থামাতে পারছিল না।

রাশিয়া ইউরোপের পূর্বাংশ দখলের পর ইউরোপ আমেরিকার একমাত্র চিন্তা ছিল - পূর্ব ইউরোপ প্রবেশ দ্বারে রাশিয়ান বাহিনীকে থামিয়ে দেওয়া। একসময় তারা জার্মানি পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেমনটা আপনারা জানেন বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিকে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছিল, পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি। পূর্ব জার্মানি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। এমনকি রাশিয়া ইউরোপের একেবারে গভীরে প্রবেশ করে ফেলে। নেদারল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরি, ইউরোপের এ সকল দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমেরিকাসহ পশ্চিমা সকল নেতাই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

এই অবস্থার মধ্যেই ইউরোপ-আমেরিকার জন্য একটি বিশাল ধাক্কা আসে। যেই ইথিওপিয়া কয়েক দশক ধরে খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করে আসছিল, তাও রাশিয়ার অধীনে পরিচালিত হওয়া শুরু করে। অবশ্য অল্প কিছু কাল মুসলিমরা সেটাকে ইসলামী হুকুমতের অধীনে ধরে রেখেছিল। ইথিওপিয়ার অধিকাংশ জনগণ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা খ্রিষ্টানদের অধীনে রয়ে গিয়েছিল। তাদের সর্বশেষ নেতা ছিল সম্রাট হেইল সেলেসি। রাশিয়া সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘটাতে সক্ষম হয়, যারা ছিল ইথিওপিয়ার সেই সমস্ত সন্তান, যারা রাশিয়াতে পড়াশোনা করেছিল। সেখানে তাদেরকে সমাজতন্ত্র ও কুফরি শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

এরপর মেনজিস্তু হাইল ফিরে এসে ইথিওপিয়ার কর্তৃত্ব হাতে নেয়। এর ফলে আফ্রিকার এই বড় দেশটিও সোভিয়েতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই বাহিনীর অগ্রযাত্রা মধ্য আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত চলতে থাকে। এমনকি রাশিয়া একসময় কিউবা দখল করে, ফিদেল কাস্ত্রোর মাধ্যমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করে। যে কিউবা আমেরিকার সমুদ্র তীর থেকে একশ মাইলেরও কম দূরত্বে ছিল।

দুর্বল জাতিগুলোকে দখল করার প্রতিযোগিতা চলছিল। তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছিল ও নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করা হচ্ছিল। যদিও তারা মুসলিম ছিল না বা ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না। অর্থাৎ যেকোনো শক্তি বা রাষ্ট্রের জনগণ এই বিশাল শক্তির দখলদারিত্বের বাইরে বসবাস করার ইচ্ছা করত, তাদেরকেই তারা হত্যা ও ধ্বংস করে দিত। তো, এই পরমাণু অস্ত্র আর প্রচলিত ও অপ্রচলিত অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় রাশিয়া যখন শব্দগতির চেয়ে অতিদ্রুত গতিসম্পন্ন বিমান তৈরি করে ফেলল, তখন আমেরিকাও তার মতো বিমান তৈরি করল। এ প্রতিযোগিতায় মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় হলো। সেই সময় সোভিয়েত জোটের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ ইচ্ছা করল, ইউরোপ অ্যামেরিকাকে একটি কঠিন আঘাত করবে।

ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ পেট্রোলের মজুদ ছিল না। এর ফলে তাদেরকে আরব বিশ্বের পেট্রোল এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের পেট্রোলের উপর নির্ভর করতে হতো। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের কৌশল ছিল, প্রথমেই আরববিশ্বকে দখল করে নেওয়া।

এটা এমন একটি স্বপ্ন, যা মস্কোর নেতারা অনেক পূর্ব থেকেই দেখে আসছিল। পেট্রোল আবিষ্কারের পূর্বে তাদের লক্ষ্য ছিল আরব উপদ্বীপের উষ্ণ পানির উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কেননা রাশিয়ার উত্তর দিকের পানির উৎসগুলো দুই মাসের অধিক সময় ব্যবহার করা যেত না। যখন শীতকাল চলে আসত, তখন এই সমুদ্র বরফে পরিণত হয়ে যেত। তাই রাশিয়ার স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ ছিল আরবের উষ্ণ পানির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করা।

পূর্ব-পশ্চিমের এ প্রতিযোগিতা ও পেট্রোল আবিষ্কারের পর, ব্রেজনেভ আরব ও তার তেল ক্ষেত্রগুলো দখলের মাধ্যমে ইউরোপ আমেরিকার উপর চূড়ান্ত আক্রমণের পরিকল্পনা করে। আর এই স্বার্থ থেকেই আফগানিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়। তাই আফগান ছিল অন্য বড় একটি স্বার্থ অর্জনের মাধ্যম। কারণ আফগানিস্তান হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে থাকা ইসলামী রাষ্ট্র গুলোতে আসা-যাওয়ার পথ। তারা প্রথমে আফগানিস্তান দখল করবে এরপর আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করবে, এভাবে পুরো আরববিশ্বকে দখল করে নেবে এবং সেই সমস্ত ছোট রাষ্ট্রের জনগণকে গুম, হত্যা করতে শুরু করবে। এটাই তাদের পরিকল্পনা ছিল। তারা কুয়েত থেকে শুরু করে ওমান পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে যাবে ভেবেছিল।

তখন আরববিশ্বে আমেরিকার হাতে শুধু আরব উপদ্বীপ ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট ছিল না। এমনকি মিশরের আব্দুল নাসের সোভিয়েত জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জামিআ আজহারের প্রধান মুফতি বলছিল, 'সমাজতন্ত্র ইসলামেরই অংশ'। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এটা ছিল তার উপর আব্দুল নাসের এর চাপের ফল। এমনকি সুদানের শাসক জাফর পর্যন্ত সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করে নেয়। ফলে তখন পুরো আরববিশ্ব সোভিয়েত জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

ঠিক সেই সময় যখন আফগানিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন রাজনীতিবিদ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন লোকেরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, এই যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোল দখল করা। কারণ আফগানের শুষ্ক মরুভূমি বা রুক্ষ পাহাড়ে তাদের আশার কিছুই নেই। আর এই কারণেই ১৩৯৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৮০ সালের ২০ জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে কথা বলতে শুরু করে, যদিও তার মধ্যে ভয় কাজ করছিল। কারণ এ অঞ্চলে রাশিয়াকে প্রতিহত করার মতো তাদের কোনো সহযোগী ছিল না। যদিও সেখানে পূর্ব থেকেই তাদের ঘাঁটি ছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল অনেক ছোট। মার্কিনীরা উপসাগরের প্রভাবশালী নেতা ইরানের বাদশাহর উপর কিছুটা ভরসা করত, কিন্তু ইরানী বিপ্লব এসে তাদের সে ভরসাও শেষ করে দেয়। তখন তারা ইরানের বাদশাহ থেকেও হাত গুটিয়ে নেয়। এমনকি তারা তাকে রাজনৈতিক আশ্রয়টুকুও দেয়নি। এভাবে ইরানে তাদের সকল এজেন্ট থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ফলে শাস্তি জরিমানা যা হওয়ার সব আমেরিকার এজেন্টদের ভাগ্যে জোটে।

ইরানের বাদশার পরিণতি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। বর্তমানে আরব উপদ্বীপে যারা নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার উপর নির্ভর করছে, তারা মূলত উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে। যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং বুদ্ধিগত কোনও দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের দ্বীন কোনো অবস্থাতেই এ কাজের বৈধতা দেয় না। বরং তারা মুসলিম দেশগুলো কাফেরদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে ইসলামের দুশমনদের সাথে আঁতাত করেছে। কাফেরদেরকে সাহায্য করছে, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। অন্যদিকে চিন্তাগত দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা সঠিক নয়, কেননা ইহুদী-নাসারা হচ্ছে এই উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রু। তারা মুসলিমদের কোনো অঞ্চলে আসে একমাত্র ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, মুসলিমদেরকে নির্যাতন এবং তাদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য। অতি শীঘ্রই আমেরিকা মুজাহিদদের আক্রমণের ফলে আরব উপদ্বীপ থেকে বের হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যাতে তিনি সেই ভূমিতে আমাদের ভাইদেরকে বিজয় দান করেন।

এভাবে আফগান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ১৪০৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৮৬ সালে আমি কোয়েটা থেকে ভারত মহাসাগর হয়ে ওমান উপসাগর পর্যন্ত সফর করলাম। বেলুচিস্তানের কোয়েটা থেকে ওমান পর্যন্ত যতগুলো শহর বা গ্রাম অতিক্রম করেছি, অত্যন্ত আফসোসের সাথে প্রত্যেকটি স্থানে মস্কো থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত বেলুচ কমিনিষ্ট পার্টির লাল পতাকা উড়তে দেখেছি। তারা অধিকাংশ

শহর ও গ্রাম দখল করে নিয়েছিল। এমনকি সেখানের প্রতিটি গোত্রের বৈঠকখানাগুলোতে কার্লমার্ক্স, লেলিন ও স্টালিনের ছবি দেখেছি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বেলুচ কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যেক বছর ২৭ ডিসেম্বর সারা দেশে জনসমাবেশ করত। এটা ছিল রাশিয়ান বাহিনী আফগানে প্রবেশের দিন। তারা সেদিন বিশাল আকারে অনুষ্ঠান করত, যাতে কমিউনিস্ট পার্টি এসে তাদেরকে সংবর্ধনা দেয়। সুতরাং সেখানে কোনো প্রতিরোধ ছিল না; বরং রুশ বাহিনীকে প্রবেশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছিল। আরব উপদ্বীপ দখল করা, তাদের নেতাদেরকে গুম করা ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের মাঝে কোনো বাধাই তখন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আফগানের মুসলিমদেরকে সাহায্য করেছেন, ফলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মানব ইতিহাসের শেষ যুগের সবচেয়ে বড় আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। যেই যুদ্ধ তাদের দেশ তছনছ করে দিয়েছে, সন্তানদেরকে এতিম করে দিয়েছে, নারীদেরকে বিধবা বানিয়েছে, ঘর-বাড়ি ও শহরগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা এই যুদ্ধে অগণিত মুজাহিদ প্রেরণ করেছে এবং বিশাল ত্যাগ স্বীকার করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উপযুক্ত প্রতিদান দান করুন। এই সেই আফগান, যাকে আজ তোমরা বিধ্বস্ত দেখছ।

সুতরাং এই ছিল আফগান-রাশিয়া যুদ্ধের পূর্ব পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতা। তাদের চেষ্টা ছিল ইসলামী বিশ্বের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং ওহি নাযিলের ভূমি জাযিরাতুল আরবে পৌঁছে যাওয়া। কিন্তু আল্লাহ তাআলা উম্মাহর এই মহান ব্যক্তিদের মাধ্যমে রাশিয়াকে প্রতিহত করেছেন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশা রাখি, তিনি যেন তাদের নিহতদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন, আহতদেরকে সুস্থ করে দেন, এতিম ও বিধবাদেরকে সাহায্য করেন, নিশ্চয় তিনি উত্তম অভিবাবক ও সর্বক্ষমতার অধিকারী।

আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষকে স্পষ্ট কুফরের দিকে আহ্বান করতে শুরু করে। তখন তাদের সামনে কিছু আলেম ও যুবক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের কার্যক্রম ১৩৯৫ হিজরী থেকে সামনে আসে। কিন্তু তাদের সক্ষমতা ছিল অনেক স্বল্প। এতটাই স্বল্প যে, তারা একটি বাসা ভাড়া নিয়েছিল তাদের কাজের অফিস হিসেবে, সেখানে তারা মিটিং সম্পন্ন করত। কিন্তু একমাসের বেশি সে ঘরের ভাড়া দিতে না পারায় তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা কিছু মুজাহিদ নেতাকে সে সময় সাহায্য করলেন। তাঁরা কমিউনিস্ট পতাকা ছুড়ে মারলেন। তাঁদের প্রতি আমাদের ইনসাফ করা চাই, তাঁদের যথাযথ সম্মান করা চাই। কারণ তাঁদের কারো কারো বিরাট কুরবানী রয়েছে। পরে যদিও একসময় তাঁদের পদস্খলন ঘটেছিল।

অতঃপর যখন রাশিয়া আফগান থেকে বের হয়ে গেল, দুঃখজনকভাবে তারা ইখতিলাফ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে গেল, যা ছিল আরও বেশি ক্ষতিকর। আমি আপনাদেরকে এই কথাটা বারবার বলেছি, এই দ্বীন কখনো ইখতিলাফ ও অনৈক্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কখনো হয়তো শত্রুকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবেন, কিন্তু ইখতিলাফের মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। যেমনটা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

(من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)

'যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামাআত থেকে এক বিঘত সরে যাবে, সে যেন তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।'

ইসলাম ও জামাআত একই জিনিস, এর মধ্যে কোনো একটি নষ্ট হলে অপরটি নষ্ট হয়ে যাবে। যেমনটা আল্লাহর নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন,

(وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن، الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله)

'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি জিনিসের আদেশ দিচ্ছি, যেগুলো আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ দিয়েছেন। জামাআত, শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।'

শাইখ ইউনুস খালিস রহ.-কে আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে এ সমস্ত বিভক্তি ও পার্থক্য থেকে রক্ষা করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে উম্মাহকে উপকৃত করেছেন। আমরা তখন এই বিভক্ত জাতিকে ত্যাগ করে সুদানে চলে গেলাম। কিন্তু সুদান থেকেও ১৪১৭ হিজরীর প্রথম দিন বিতাড়িত হলাম। এটা ছিল সেই দিন, যেদিন আল্লাহর নবী মক্কার কুরাইশদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিয়াবে আবু তালেবে প্রবেশ করেছিলেন। সে দিনটি ছিল নবুয়তের সপ্তম বছরের প্রথম দিন, যা দীর্ঘ তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল। আমরা তখন সুদান থেকে বের হয়ে শাইখ ইউনুসের কাছে এসে সমস্ত বিভক্তি ও দলাদলি মুক্ত হয়ে তাঁর কাছে অবস্থান গ্রহণ করেছিলাম।

এক সময় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর দয়া করলেন। ফলে তারা এমন একজন ব্যক্তির অধীনে একত্রিত হয়ে গেল, যিনি আফগানিস্তানের ভেতরে বা বাইরে কোথাও তেমন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু একত্রিত হওয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয় দান করলেন, তারা আফগানিস্তানে ৯৫% এর বেশি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই।

তখনকার সময়ে মানুষ ধোঁকাবাজ মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা এবং সরকারি ফতোয়ার কারণে মুজাহিদদেরকে হত্যা করত। তারা মানুষকে বলত মুজাহিদরা খারেজী, এরা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। অথচ তখনকার শাসক ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকারকারী, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কাফের, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। মানুষ তাদেরকে নামাজ পড়তে দেখে ধোঁকা খেয়েছিল।

সোভিয়েত জোটের প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল, সে পেট্রোল দখল করার মাধ্যমে ইউরোপ আমেরিকার টুঁটি চেপে ধরার যে উদ্ধত খাহেশ প্রকাশ করেছিল, তা বাস্তবায়নে ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সরাসরি আক্রমণ করে বসল। সাধারণ জনগণ যখন রাশিয়ান সেনা দেখতে পেল, তখন তাদের ভুল ভাঙল এবং এ বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এটা ইসলামের উপর আঘাত, এটা কুফরী শক্তি। ফলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই আফগান জাতি লাল বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

আফগানবাসী ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সচেতনতাসহ এমন বহু গুণের অধিকারী ছিল, যা থেকে আরববিশ্বসহ অনেক ইসলামী দেশ বঞ্চিত ছিল। আরববিশ্ববাসী অনেকেই মানুষকে ভয় পেত, আল্লাহর উপর তাদের ভরসা ছিল না। আফগানবাসী আলেমদের ফতোয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সময় আফগানের বড় বড় আলেমরা ফতোয়া দিয়েছেন, যাদের মধ্যে ছিলেন শাইখ ইউনুস খালিস রহ., শাইখ জালালউদ্দিন হাক্কানী। আল্লাহ তাঁদের হায়াতে বরকত দান করুক, তাঁদের সমস্ত আমল কবুল করুন।

এই ফতোয়ার পর আফগানিস্তানের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র পবিত্র জিহাদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। শুরু হয় সশস্ত্র জিহাদ। কবিলা ও গোত্রগুলো আনন্দিত হয়ে যায়, তাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে এবং তাদের মধ্যে শহীদদের ইতিহাস সংরক্ষণ করতে শুরু করে। এই যুদ্ধটা এমন একটা সময়ে শুরু হয় যখন পুরো বিশ্ব রুশশক্তির সামনে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসকেও গোপন করার চেষ্টা করছিল।

এই দুরবস্থার মধ্যেই ১৯৮০ সালের ২০ শে জানুয়ারি জিমি কার্টার মিডিয়াতে এসে ঘোষণা দেয়, 'নিশ্চয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে আরব উপদ্বীপের দখল নিতে দেবে না।' এ সমস্ত কাফেররা আমাদের সম্পদ নিয়ে, আমাদের রাষ্ট্র নিয়ে এবং আমাদের সমুদ্র নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। সে বলল, 'আমরা তাদেরকে আরব উপদ্বীপে প্রবেশের অনুমতি দিব না এবং অতি শীঘ্রই আমেরিকা তাদের সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে, যদি তা করতে বাধ্য হয়।' অথচ বাস্তবে এই হুমকি ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই ছিল না। কারণ সেই অঞ্চলে ইরানের শাহের পতনের পর তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো শক্তির অস্তিত্বই ছিল না এবং সেই অঞ্চল পুরোটাই সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল। তাই তার এই হুমকি ছিল একটি ফাঁকা বুলির মতোই। যদি আফগানীদের জিহাদে আল্লাহ তাআলার সাহায্য না থাকত, তাহলে আরব উপদ্বীপ আল্লাহর শত্রুদের হাতে চলে যেত এবং তারা সেখানে সমাজতন্ত্রের সংবিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করত। তাদের অবস্থা সেই সময়ের দক্ষিণ ইয়েমেনের অবস্থার মতোই

হয়ে যেত। কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন এবং এই দ্বীনের উপর থেকে শত্রুকে প্রতিরোধ করার তাওফীক দিয়েছেন।

রাশিয়া আফগানিস্তানের প্রবেশের সাথে সাথেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজেদেরকে একত্রিত করে ফেলে। কারণ আফগান পতনের পর অধিক সম্ভাবনা রয়েছে তাদের উপর হামলা হবার। এটা হচ্ছে পাকিস্তান, এটা হচ্ছে আফগানিস্তান, এটা হচ্ছে সোভিয়েত জোট, এটা হচ্ছে বিশাল ভারত যা ভূমি, আয়তন, শক্তি, অর্থনীতি ও সেনাবাহিনীর দিক থেকে দানব একটি রাষ্ট্র। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। পাকিস্তান তখন একটা সাঁড়াশি জালে আটকা পড়ে যায়, কারণ রাশিয়া ও ভারতের মাঝে মৈত্রী চুক্তি ছিল, এর ফল হচ্ছে অবশ্যই পাকিস্তানকে দখল করে নেওয়া হবে।

তাই পাকিস্তানের নেতা ও কমান্ডাররা এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার পথ বের করতে বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকে আলোচনা হচ্ছিল প্রস্তুতি নেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে। এছাড়া সোভিয়েত জোটের বিরুদ্ধে কী পরিমাণ শক্তি রয়েছে এবং তা জমা করার কেমন সময় তাদের হাতে রয়েছে তাও আলোচনায় ছিল। তাদের তো ভারতের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ জয়ের সক্ষমতা নেই, এই অবস্থায় যদি রাশিয়া পেছন থেকে আক্রমণ করে, তাহলে অবস্থা কতটা ভয়াবহ হবে! তাদের মধ্যে একজন বলল, আফগানিস্তান এক সপ্তাহের বেশি সোভিয়েতের বিরুদ্ধে টিকতে পারবে না। তারা পরাজিত হবে, যেমনিভাবে রোমানিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের পতন হয়েছে। তাদের মাঝে অধিক বিচক্ষণ ব্যক্তি বলল, তারা দুই মাসের মতো রাশিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়টা পুরো বিশ্ব কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা ছাড়া একদম নিশ্চুপ বসে ছিল। আরব দেশগুলো একটি শব্দ উচ্চারণ করেনি, যদিও তারা স্পষ্টভাবেই জানত এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য একমাত্র তারাই।

এখানে কোনো অহংকার ছাড়া বলছি, যখন রেডিওতে শুনলাম আফগানিস্তানে সোভিয়েত জোট প্রবেশ করেছে, তখন আমি ১৩৭৯ হিজরীতে আল্লাহ তাআলার সাহায্যে সৌদি প্রশাসন ও অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে গোপন হয়ে মুজাহিদদেরকে সাহায্য করতে চলে এলাম। আমি আক্রান্ত হওয়ার ভয় পাচ্ছিলাম, কারণ সেই সমস্ত রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রচণ্ড ভয়ের কারণে এই দখলদারিত্বের বিপক্ষে কোনো ধরনের কথা বলছিল না।

দুই মাস অতিবাহিত হওয়ার পর, তারা আফগানিস্তানের পরিস্থিতি বোঝার জন্য কিছু লোক প্রেরণ করে। তারা এসে দেখতে পেল আফগানীদের মানসিকতা অনেক অনেক উঁচু। তারা গরিব, তারা দুর্বল, তারা খালি পা, তাদের পেটে খাবার নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার উপর তাদের বিশ্বাস ও ভরসা প্রচণ্ড। আর তাদের কাছে ছিল সেই সমস্ত বন্দুক, যা দিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সেগুলো ছিল অনেক পুরাতন বন্দুক। এমনকি অনেক আফগানী নিজের বকরিকে বিক্রি করে দিচ্ছিল এই পুরাতন অস্ত্রের বুলেট কেনার জন্য।

পরিদর্শকরা এই খবর সেই সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছাল। যখন পশ্চিমা দেশগুলো দেখল জিহাদের ধারাবাহিকতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আফগানীদের পর্যাপ্ত হিম্মত রয়েছে, তখন ইউরোপ-আমেরিকা তাদের অনুগত শাসক ও সমস্ত মিত্রশক্তিকে আফগানীদের সাহায্যের আদেশ দিল এবং তারাও সোভিয়েত জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করল।

তারা তখন মিডিয়াতে আনন্দ প্রকাশ করতে শুরু করল এবং শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে থাকল। যুদ্ধের দুই মাস পর সে অঞ্চলের শাসকদের কাছে উপরের পক্ষ থেকে অনুমতি আসার পর, সৌদিসহ আরববিশ্বের মিডিয়াগুলো প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় রেডিওতে মুজাহিদদের খবর, তাদের বীরত্বের ঘটনা, রাশিয়ার ট্যাংক ধ্বংসের সফলতা, তাদের বিভিন্ন যুদ্ধের বিজয়গুলো প্রচার করছিল। হারামাইন থেকে নিয়ে পুরো আরববিশ্ব থেকে তাদের জন্য অনুদান সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে আফগান জিহাদে সাহায্যের আদেশ দেওয়া হয়। ইফতা বোর্ড থেকে ফতোয়া বের হয়, আফগানিস্থানের জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরজে আইন। এটা তো তারা বলেছে, কিন্তু বাস্তবে ফতোয়া এসেছে বাহ্যিকভাবে শাসকদের অনুমতি ও বাস্তবিক অর্থে আমরিকার অনুমতির পরেই। আরবের এম্বাসিগুলোতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যারা আফগান জিহাদ করতে যাবে, তাদের ভিসা ও টিকেটের মূল্য ৭৫% ছাড় দেওয়া হবে অর্থাৎ আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য মাত্র ২৫% অর্থ ব্যয় করতে হবে।

রাশিয়ার বিশাল শক্তির প্রতি প্রচণ্ড ভীতির কারণে আমেরিকা, ইউরোপ ও আরব কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তারা দেখতে পাচ্ছিল না উম্মাহর মধ্যে পুনরায় জিহাদের চেতনা জাগ্রত করার ফলে তাদের উপর কী ধরনের বিপদ আসতে পারে; বরং তখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পুরো বিশ্বকে দখল করে নেওয়ার উপক্রম রাশিয়ান হিংস্র ভাল্লুককে যেকোনো মূল্যে আটকানো। এই চরম ভয়-ভীতি ও রাশিয়াকে যেকোনো মূল্যে আটকানোর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই আমাদের সামনে সমস্ত দরজা খুলে যায়; বরং ভেঙে যায়। এর ফলে তাগুতি শক্তির পক্ষ থেকে দীর্ঘ বাধা-নিষেধের পর আমরা আবার আল্লাহর সাহায্যে আফগানে চলে আসতে সক্ষম হলাম।

যখন উম্মাহকে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কিনারা থেকে উঠিয়ে আনা এবং দুর্বলতা, পিছিয়ে পড়া, অজ্ঞতা, অসুস্থতা ইত্যাদি সকল সমস্যা থেকে উত্তোলনের যোগ্য কোনো নেতা ছিল না, তখন আফগান যুদ্ধ আমাদের সামনে এই ঘাটতি দূর করার বিশাল সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু আফসোস! উম্মাহর বড় ব্যক্তিরা তাদের কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসেনি; বরং যুবক ও মধ্যম শ্রেণীর ছাত্ররাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কালিমার সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। বড়দের মধ্যে হতে একজনও এগিয়ে আসেননি, শুধু শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রহ. ব্যতীত।

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার)

তাই বর্তমান জিহাদে সমস্ত মুসলিমরা আফগানের কাছে ঋণী এবং পুরো আরব শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রহ.-এর কাছে ঋণী। আল্লাহ তাআলা শাইখকে উম্মাহর হক্বপন্থী আলেম হিসেবে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং দুই সন্তানসহ উনাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

অতঃপর যুদ্ধ তার ফলাফল প্রকাশ করল এবং সোভিয়েত জোট ভেঙে গেল। সেই সময় আমেরিকা ও তাদের কর্মকর্তারা উম্মাহর মধ্যে এই বরকতময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও জিহাদের প্রভাব দেখতে পায়। তাই তারা প্রতিষ্ঠিত সকল নেতা ও কমান্ডারদেরকে শেষ করে দেওয়া শুরু করে। আফসোসের সাথে বলতে হয়, এটা ছিল উম্মাহর জন্য বিশাল একটি সুযোগ। কেননা আফগান ময়দান জাতিকে পরিচালনার যোগ্য নেতা ও কমান্ডার দ্বারা পিপাসিত উম্মাহকে পরিতৃপ্ত করার জন্যে যথেষ্ট ছিল। একটা জাতি সেনা, রসদ ও অস্ত্রে যতই শক্তিশালী হোক, যদি যোগ্য নেতৃত্ব না থাকে, তখন সেই ইটগুলো দ্বারা কোনো কিছু তৈরি হয় না। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

তখন আব্দুল্লাহ আজ্জাম রহ.-কে গুপ্তহত্যা করা হয়। এই দুর্বল বান্দাকেও গুপ্তহত্যা করা, নির্যাতন করা ও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রহ.-এর পর আমরা পতাকাকে ধারণ করলাম। আল্লাহর কাছে আশা রাখি, তিনি তা তোমাদের কাছে ও অন্যান্য ভাইদের কাছে অর্পণ করার তাওফীক দিবেন। তোমরাও পরবর্তীদের হাতে তা তুলে দেবে, যাতে আল্লাহর সাহায্যে এই কালিমার পতাকা সর্বদা উঁচু হয়ে উড়তে থাকে।

এই দীর্ঘ যুদ্ধে আফগানরা কী অবদান রেখেছিল, তা আপনারা জানেন এবং সোভিয়েত জোটের শক্তির কি বিশাল ক্ষতি হয়েছিল তাও আপনাদের জানা আছে। তারা পরবর্তীতে স্বীকার করেছিল, আফগান যুদ্ধে তাদের সর্বমোট ব্যয় হয়েছিল ৭০ মিলিয়ন ডলার। এই যুদ্ধের পর জাজি'র যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, সোভিয়েত জোটের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গর্ভাচেভ, যে ব্রেজনেফ ও তার পরবর্তী কয়েকটা নেতা শেষ হওয়ার পর ক্ষমতা পেয়েছিল, সে আফগান থেকে জরুরি ভিত্তিতে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিল।

হে ভাইয়েরা, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তখন সোভিয়েত জোটের প্রচণ্ড ভয়ে সাধারণ-বিশেষ কেউই বিশ্বাস করত না যে, আফগানরা তাদেরকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। উম্মাহর মধ্যে রাশিয়ানদের ভয় উপর থেকে নিচ সবাইকে গ্রাস করে নিয়েছিল। আমরা আফগানে হিজরতের সময় শাইখরা আমাদের প্রতি দয়া পরশ হয়ে সান্ত্বনা দিতেন। তারা বলতেন, রাশিয়াকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, ইত্যাদি আরো অনেক কথা। কিন্তু এখন যখন সোভিয়েত জোট চলে যাওয়ার খবর প্রচারিত হলো, তখনও মানুষেরা অন্ধবিশ্বাসের কারণে চিন্তাও করতে পারছিল না। তারা ভাবছিল, রাশিয়া এই খবর ছড়িয়ে মুজাহিদদেরকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে। অনেকে তো স্পষ্টই আমাদেরকে অপবাদ দিচ্ছিল, তারা বলছিল, তোমরা কি পাগল! তোমরা রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করতে চাও! এমনকি আরবের নেতারাও মুজাহিদ শাইখদের সাথে এই ভাষায় কথা বলত। যখন তাদের সেনা সরিয়ে

নেওয়ার খবর প্রচারিত হলো, তখন মানুষ এটা ধোঁকা হিসেবে গণ্য করছিল। অনেক সৎ ব্যক্তিরাও বলেছিলেন, আফগান যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে রাশিয়ার অনেক স্বার্থ রয়েছে। অন্যথায় তারা ২৪ ঘণ্টার ভেতরেই যুদ্ধ শেষ করে ফেলতে পারে। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ - আল্লাহ তাআলার কাছেই সব অভিযোগ।

পরবর্তী আলোচনা হক ও বাতিলের মাঝে চলতে থাকা দীর্ঘ যুদ্ধ ও হাজারো লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফয়সালাকারী মহান 'জাজি যুদ্ধে'র ভূমিকা। গর্ভাচেভ যখন বের হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সোভিয়েত জোটের প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের একটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তারা বলে, 'যদি আমরা আফগান থেকে সরে আসি, তাহলে তা হবে বৈশ্বিক কমিউনিজম, সোভিয়েত জোট ও রাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বিশাল একটি পরাজয় ও লাঞ্ছনা। তাই আমাদের এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা আবশ্যক'। সে তাদেরকে বলল, 'বিষয়টা এর থেকেও বড়, এই মুহূর্তে সোভিয়েত জোটের ভান্ডারে তোমাদের সন্তানদের জন্য দুধ ক্রয়ের টাকাও অবশিষ্ট নেই।' আফগান যুদ্ধ সোভিয়েত জোটকে আস্তে আস্তে নিঃশেষ করে ফেলেছিল। সেই সাথে আল্লাহর ইচ্ছায় সোভিয়েতের অভ্যন্তরেও অনেকগুলো কারণ তৈরি হয়, যা তাদেরকে ভেঙে ফেলে। আর এই মহান যুদ্ধটা ছিল তৃতীয় আঘাত, আল্লাহর ইচ্ছায় যা তাদের মেরুদন্ডকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

তারা ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে প্রবেশ করে ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বের হয়ে যায়। প্রায় দশ বছর তারা আফগান দখলে রেখেছিল। তারা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আফগানে প্রবেশ করে, আল্লাহর ইচ্ছায় দশ বছর পর ১৯৮৯ সালের সেই সপ্তাহে অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর এক সাথে পুরা বিশ্ব থেকে সোভিয়েতের সমস্ত দূতাবাসের পতাকা নামিয়ে ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলা হয়। সোভিয়েত জোটের প্রভাব বিলুপ্তির পর সে স্থানে রাশিয়ার পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরা-টুকরা হয়ে যায়, তাদের জোট থেকে ১৫টি রাষ্ট্র বের হয়ে যায়।

অন্যদিকে পূর্ব জার্মান, রোমানিয়া, মাজার, স্লোভাকিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলো গর্ভাচেভের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। তারা তাকে আফগান থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত তুলে নেওয়ার জন্য বল প্রয়োগ করতে থাকে। তারা তাকে বলে, 'শুধু এই ঘোষণাটাই আমাদের পায়ের নিচের মাটিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। আমাদের গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে আসছে, জনগণ বলাবলি করছে, "যদি এই ফকির, মিসকিন, উলঙ্গ, ক্ষুধার্ত ও জুতাবিহীন ব্যক্তিরা রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে আমরা তো তাদের থেকে এই বিষয়ে আরো বেশি যোগ্য ও সক্ষম"। যদি এই সিদ্ধান্ত বাতিল না করা হয়, তবে জার্মানি, রোমানিয়াসহ পুরা বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোকে হারাতে হবে। সে বলল, 'আমি এই বিষয়গুলো জানি, কিন্তু আমার কাছে যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার মতো আর কোনো শক্তি নেই।' সকল প্রশংসা ও সাহায্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রচণ্ড চাপের ফলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী একটা পরিকল্পনা পেশ করে এবং সোভিয়েত জোটে প্রেসিডেন্টের কাছে প্রতিরক্ষা বাজেটের বাইরে বিশেষ একটি বাজেট দাবি করে, যা তাদের হাতে হস্তান্তর করা হবে। তারা তাকে ওয়াদা দিয়ে বলে, 'আফগানীরা দীর্ঘ লড়াইয়ে অনেক ক্লান্ত ও অক্ষম হয়ে পড়েছে, এর ফলে প্রতিরোধ যুদ্ধ দুর্বল হয়ে গেছে।' তাদের এই তথ্য ছিল বাস্তব। কিন্তু ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আরব থেকে টগবগে তাজা রক্তের অধিকারী যুবকরা এসে আফগানী মুজাহিদদের মনোবলকে আবার চাঙা করে তুলতে সক্ষম হয়।

তখন আফগানী মুজাহিদদের অবস্থা ছিল এমন - তাদের দেশ হাতছাড়া হয়ে গেছে, ঘর-বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে, পরিবার-পরিজনকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাদেরকে মরুভূমিতে নির্বাসিত করা হয়েছে। তারা দেখছিল আফগান থেকে কিছু মানুষ সৌদিতে গিয়ে তাদের জন্য প্রলুব্ধকারী বেতনে চাকরি করছে। ফলে শয়তান তাদের মনে সেখানে যাওয়ার কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। সেখানে সম্পদ আছে, হারামাইন আছে, শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে। ফলে তারা আরব শাসকদের পক্ষ থেকে অনেক লাঞ্ছিত হওয়ার পরেও সেই রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে।

অন্যদিকে আরবের বিভিন্ন দেশের সম্ভ্রান্তরা দেশ ও জাতীয়তা নির্বিশেষে দুনিয়া ও ভোগবিলাস ছেড়ে তরবারির ছায়ায় বাংকারগুলোতে ভিড় করতে থাকে। কেননা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন ও সুসংবাদ দিয়েছেন। আর তারা সেই সুসংবাদে পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

‘নিশ্চয় তরবারির ছায়াতলে রয়েছে জান্নাত।’

আফগানীরা যখন দেখল প্রচুর নেয়ামতের অধিকারীরা নিয়ামত ছেড়ে যুদ্ধের বাংকারে এসে একত্রিত হচ্ছে, তখন তা তাদের মাথা থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণাগুলো দূর করে দেয়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে বিজয় ও রাশিয়ার বের হওয়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধকারী ও আনসার হিসেবে অটল-অবিচল থাকে।

প্রসিদ্ধ জাজি যুদ্ধের ভূমিকা হিসেবে আজকে এতটুকুতেই শেষ করছি। আমরা পরবর্তী আলোচনায় তা শেষ করব ইনশাআল্লাহ।

وصلّ اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

****